কার্তিক ঘোষ

আমার বন্ধু গাছ

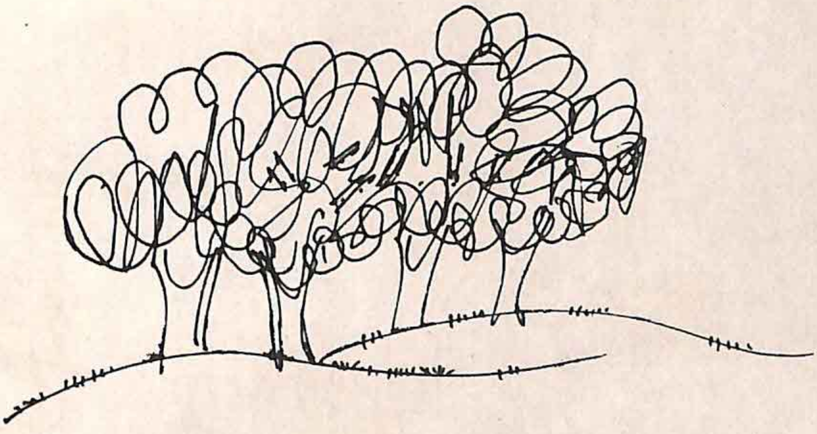






আমার বন্ধু গাছ

কার্তিক ঘোষ



দে'জ পাবলিশিং □ কলকাতা ৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ ❑
কলকাতা বইমেলা ১৯৯২

প্রকাশক ❑
সুভাষচন্দ্র দে
দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট
কলকাতা ৭০০ ০৭৩

প্রচ্ছদ □ অমিয় ভট্টাচার্য

রূপায়ণে □ শংকর প্রসাদ মজুমদার

ISBN–81–7079–063–8

আলোকচিত্র ❑
সুজিত সেনগুপ্ত

লেজার টাইপসেটিং ❑
পেজমেকার্স
২৪বি লেক রোড
কলকাতা ৭০০ ০২৯

দাম ১৫ টাকা
Price Rs. 15/–

মুদ্রক ❑
স্বপনকুমার দে
দে'জ অফসেট
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট
কলকাতা ৭০০ ০৭৩

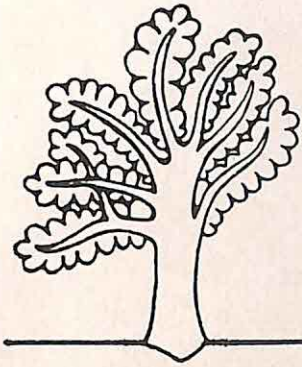


চম্পা

বুলাই

শ্রাবন্তীকে





বোবা হলেও বন্ধু

শুধু আমার নয়। আমাদের সবারই বন্ধু হচ্ছে গাছ। কিন্তু একটাই দুঃখ। গাছ কথা বলতে পারে না। পারে না বাগান থেকে বেরিয়ে ইস্টিশনের ধারে গিয়ে দাঁড়াতে।

তা না পারুক, আকাশের আলোর দিকে ডালপালা বাড়িয়ে সে দিব্যি সবুজ ইসারা পাঠায় আকাশকে। তোমরা সবাই সে সব খেয়াল করো কি না আমি জানি না। তবে আমি, আমাদের পাশের বাড়ির মিঠিমনি, টুপুর আর ওদের ইসকুলের বাচ্চু, আপু, পাপু, ইতাদিদি সবাই দিব্যি বুঝতে পারি গাছেরা পাতার হাতছানি দিয়ে কেমন করে ডাকে।

ছুটির দিনেও বেশ বুঝতে পারি ওদের আনন্দ।

পুজোর সময়, আকাশে যেই তুলো মেঘ খেলতে আসে, অমনি কাশের বনে ফুল ফোটে হৈ হৈ করে। উঠোনের শিউলিগাছে আর স্থলপদ্মর গাছে তখন কি খুশি!

কিন্তু যেই কেউ এসে স্থলপদ্মর পাতা ছিঁড়ে, ডাল ভেঙে ফুল তুলে পালায়, অমনি দেখি মনের দুঃখে কেমন ঝিমিয়ে পড়ে গাছটা।

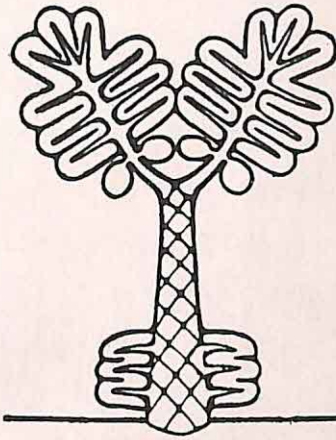
আসলে, বোবা হলেও গাছেদের যে প্রাণ আছে, সে কথা তো সবাই জানো। বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসু তার প্রমাণও দিয়ে গেছেন অনেকদিন আগে।

কিন্তু গাছকে বোবা বন্ধু বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তিনি তো কবি। তাই তিনিই ঠিক দেখতে পেয়েছিলেন, আলোর সঙ্গে ভাব করবে বলেই আকাশের দিকে হাত বাড়িয়ে থাকে গাছ। কবি বলতেন, গাছেদের ভাষাই হচ্ছে জীবজগতের আদিভাষা। গাছের পাতায় আর ফুলের ইসারায়, মনের মধ্যে যে সাড়া ওঠে, রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, তার কোনও স্পষ্ট মানে নেই, অথচ তার মধ্যে বহু যুগ

যুগান্তর গুনগুনিয়ে ওঠে।

অবশ্য টুমপি আর পাপুর মত তোমরা যারা এখন খুব ছোট আছ, কথাটা তোমরা আর একটু বড় হলেই বুঝবে। এখন বরং এসো একটা ছড়া বানাই গাছকে নিয়ে।





জড়ের পাশে জীব

আদ্যিকালের পৃথিবীর কথা তো পড়েছ। সীমাহীন মহাকাশের মধ্যে মস্ত একখানা দাউ দাউ আগুনের গোলার মত ঘুরপাক খাচ্ছিল সূর্য। কেমন করে যেন তারই একটুকরো ছিটকে বেরিয়ে এসে সৃষ্টি হলো পৃথিবীর।

সে সব তো কয়েক কোটি বছর আগের কথা। প্রথম দিকে পৃথিবীর চোহারাটাই ছিল ঠিক নাসপাতির মতন। সূর্যের মত গোল আগুনের গোল্লা হলেও আকারে তো পৃথিবী অনেক ছোট। তাই ঠাণ্ডাও হতে লাগল তাড়াতাড়ি।

কিন্তু আকারেও অনেক ছোট হতে লাগল পৃথিবী।

কেন বলো তো?

বারে! এটাই তো বিজ্ঞানের সাধরণ নিয়ম। গরম অবস্থায় যে কোনও জিনিসই আকারে বেড়ে যায়। তারপর ঠাণ্ডা হয়ে এলেই ছোট হয়ে আসে একটু একটু করে।

সে যাইহোক।

সেই ছোট্টবেলার পৃথিবীর ঠাণ্ডা হতেই লেগে গেল কয়েক কোটি বছর। তারপর একদিন গর্জন করে উঠল সমুদ্র। জেগে উঠল ডাঙ্গা। তখন তো জীবনের সাড়া নেই কোথাও। সবই জড়। জল আর হাওয়া এতো ছিলই।

কিন্তু পৃথিবীর যেখানটায় জেগে উঠল ডাঙ্গা, সেখানেই সেই পাথর আর মাটি। যাকে আমরা বলছি জড়।

তোমরা তো জানোই, জড় কথাটার ঠিক ঠিক মানে। ইট, কাঠ, পাথর, কিম্বা চেয়ার, টেবিল, শিল-নোড়া, মাটির পুতুল যারা অচেতন, কোনও চেতনাই নেই

তারাই জড় পদার্থ।

ইট কি চেয়ার-টেবিল, অথবা মাটির পুতুল কেউ হাঁটতেও পারে না। বয়েসের সঙ্গে সঙ্গে বাড়তেও পারে না কখনও।

অথচ কুকুর, বেড়াল, ময়না, শালিখ, বাঘ, ভালুক কিম্বা ছোট্ট পিঁপড়ে, জন্মের পরে পরেই ওরা কেমন নড়া চড়া করে। বড় হয়। খেলা করে। যে যার ভাষায় ডাকে। খাবার দাবারের খোঁজে বেরিয়ে পড়ে বুদ্ধি করে।

তাই আমরা ওদের জড় বলতে পারি না। বলি জীব। সবাই ওরা জ্যান্ত কিনা।

জানি, এবার তুমি কি বলবে।

বলবে, ওই যে একটু দূরে এক সারি বোবা গাছ পাতার সাজ পরে দাঁড়িয়ে আছে ওরা তাহলে কি ? কোন দলে পড়বে ?

আগেই বলে রাখি, অবশ্যই ওদের জড় বলব না কেউ।

কারণ, আমরা সবাই জানি, গাছেদেরও প্রাণ আছে। আছে ছোট্ট থেকে বড় হবার তাগিদ।

আমাদের মত গাছেরও খিদে পায়। ওরাও খায়। কিন্তু মানুষের মত হাত কিম্বা পাখির মত ঠোঁট নেই ওদের।

সে নাই বা রইল।

গাছের গোড়ায় আছে শিকড়। আর ডগে আছে পাতা। মাটির ভেতর শিকড় চালিয়ে গাছ যেমন যোগাড় করে তার খাবার, তেমনি ডালে ডালে পাতায় পাতায় আলো আর বাতাস থেকেও সংগ্রহ করে বেঁচে থাকার শক্তি।

তবু গাছেরা নড়ে চড়ে বেড়াতে পারে না। পাখিদের সঙ্গে, বাঘ, ভালুক, আর পিঁপড়েদের সঙ্গে ওইখানেই তার অমিল।

কিন্তু হাঁটতে না পারুক পশুপাখি কিম্বা মানুষের মত গাছেরও বাচ্চা হয়। বুঝতেই পারছ, আমি বলছি গাছের বীজের কথা।

ছোট্ট একটা বীজ। মাটিতে পুঁতে দাও। দেখবে হঠাৎ একদিন মাটির ঘরের জানলা খুলে উঁকি দিচ্ছে একটুখানি একটা গাছের চারা। কি মজা, তাই না ?

তবু পন্ডিতেরা ওদের নাম দিয়েছেন আলাদা করে।

কারণ ওই একটাই। পশুপাখিদের সঙ্গে গাছেদের চেহারায় যেমন মিল নেই কোনও, তেমনি চালচলনেও অনেক তফাৎ। তাই ওদের নাম হয়েছে উদ্ভিদ।

একবারে চলতি বাংলায় আমরা কি বলি ?

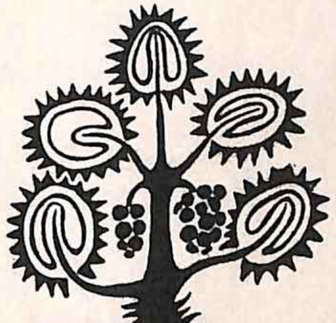
বলি, গাছপালা।

তাহলে পোকামাকড়, বাঘভালুক, ময়নাশালিখ ওদের কি বলেছেন পণ্ডিতরা ?

হ্যাঁ, ওদেরই আলাদা করে নাম দিয়েছেন প্রাণী।

বুঝতেই পারছ, এমনি করেই আদ্যিকালের পৃথিবীতে একদিন জীব এসে জন্মেছিল জড়ের আশে পাশে।

কারণ, পণ্ডিতরাই বলেছেন, গাছপালাই পৃথিবীর আদি বাসিন্দা।



আদ্যিকালের গাছ

হিসেব মত চল্লিশ কোটি বছর আগে প্রথম গাছ জন্মেছে পৃথিবীতে।

এখন যে সব গাছপালা দেখছ, তার কিছুই ছিল না সেই আদ্যিকালে। থাকবেই বা কি করে বলো !

পৃথিবীর ধরনধারণ তখন ছিল একবারে আলাদা। আবহাওয়াও ছিল অন্য রকম। সূর্য থেকে ছিটকে পড়ে তাড়াতাড়ি ঠাণ্ডা হচ্ছিল বটে, কিন্তু তবুও যা গরম ছিল তা কল্পনা করাও কঠিন।

আর সেই জন্যেই সমুদ্রের জল সব সময় বাষ্প হয়ে উড়ে যেত আকাশে। মেঘ জমত যখন খুশি। বৃষ্টিও নামত ঝমঝম করে। সূর্যের আলো মাটিতে এসে পড়বে কি করে, সব সময় মেঘ আর কুয়াশায় ঢাকা থাকত আকাশ।

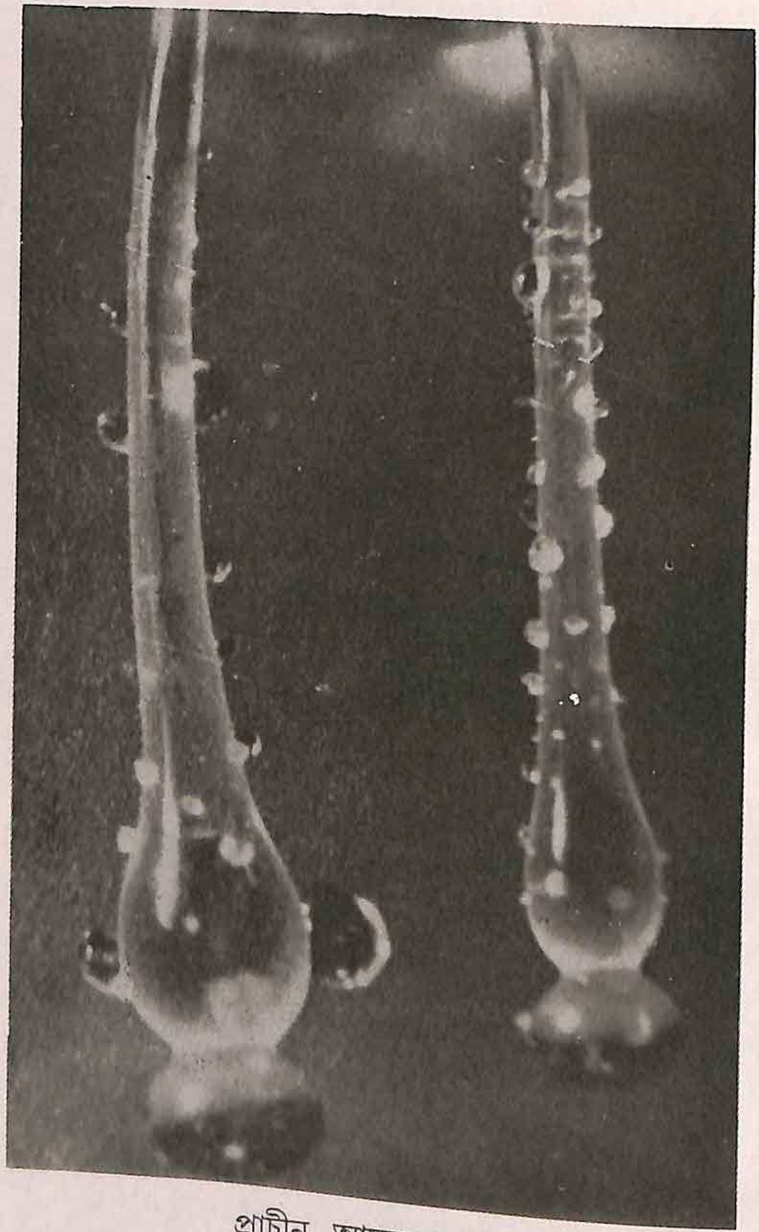
তাই জল দিয়েই শুরু হয়েছে নতুন এক জীবন। কারণ, পৃথিবীতে সেদিন জলের ভাগই ছিল সবচেয়ে বেশি।

সেই জন্যেই বোধহয় সে যুগের গাছপালা বলতে ছিল শ্যাওলা জাতের কিছু ছোট ছোট গাছ। এখনকার শ্যাওলার মত দেখতেও নয় অবশ্য। প্রথমে হয়ত একটা কোষ নিয়েই শুরু হয়েছিল তাদের জীবন।

একথার প্রমাণও দিয়েছেন বিজ্ঞানীরা। তাঁরাই পরীক্ষা করে দেখেছেন, প্রত্যেক

জীব বা গাছপালার মধ্যে একটা বিশেষ ধরনের জিনিস আছে। ইংরেজিতে বলে প্রোটোপ্লাজম। বাংলায় তাকে জীবন্ত পদার্থ বলতে পারো।

এই যে জীবন্ত পদার্থের কথা বললুম, সেইটাই পৃথিবীতে প্রথম সৃষ্টি হলো কি ভাবে এখনও জানা যায়নি সঠিক।



প্রাচীন আমলের গাছ

জলের শ্যাওলা যেই ডাঙ্গার ধারে এলো, তখন সেইসব নাম গোত্রহীন গাছেরাই উঠে এলো মাটিতে। আগেই তো বলেছি, ডাঙ্গায় তখন কোথায় জীবজন্তু, কোথায় কি !

তাই বনগাঁয়ে শেয়ালের মত শ্যাওলারাই রাজা হয়ে উঠল তাড়াতাড়ি। দেখতে দেখতে সারা পৃথিবী সেই শ্যাওলার জঙ্গলেই ঢাকা পড়ে গেল।

ভাবছ, এখন তারা কোথায় ?

ইতিহাসের রাজারাজড়াদের মতন তারাও এখন প্রায় বেশির ভাগই হারিয়ে গেছে পৃথিবী থেকে। টিকে আছে কোনও রকমে দু-চারটি। আদ্যিকালের বাসিন্দা বলে কে আর তাদের বংশ তালিকা নিয়ে মাথা ঘামাই বলো ?

সে সব গাছের চেহারা দেখলেই জানি মুখ ঘুরিয়ে নেবে তোমরাও। কারণ, বাড়ির কাছের জলাজমি আর বাগানের আশে পাশে থাকলেও চেনে তাদের কজন ? এখন আর লম্বাও হয় না মাথায়। কেউ দেখতে ঘাসের মতন সাধারণ। কেউ আবার আদ্যিকালের ফার্ণ গাছের জাত ভাই। এখন আবার তাদেরই কারো নাম হয়েছে ঢেঁকি শাক।

তাছাড়াও আরও কয়েকটা গাছের নাম বলছি শোনো।

ইকুইজেটাস, সেলাজিনেলা আর লাইকোপোডিয়াম। যারা দার্জিলিং অথবা শিলং পাহাড়ে বেড়াতে যাবে, তারা একটু খোঁজ করে দেখতে পারো। বুনো ঘাস বা ফালতু গাছ গাছালি বলে যাদের দিকে কেউ সহজে চেয়েই দেখিনা হয়ত তাদের মধ্যেই বেরিয়ে পড়বে পৃথিবীর প্রথম দিকের গাছপালাদের বংশধর।

এই যে লাইকোপোডিয়ামের কথা বললুম, শুনলে তুমি অবাক হবে সেই লাইকোপোডিয়ামের একটা পাথুরে গুঁড়ি রাখা আছে ম্যাঞ্চেস্টার মিউজিয়মে দেখলে মনে হবে, গাছটা বোধহয় ছিল বিরাট বট গাছ।

তাহলে ভাবো, সেই আদ্যিকালে এই রকম বুনো ঘাসেরাই কেমন বিশাল ছিল চেহারায় !

শুধু তা কেন !

একটু আগেই যে ফার্ণ গাছের কথা বললুম, সে গাছ ছিল তালগাছের সমান।

তাই আজকের দু-তিন-হাত দীর্ঘ ফার্ণগাছগুলোকে দেখে কে বলবে— পৃথিবীর প্রথম বাসিন্দাদের মধ্যে এরাও ছিল বনেদি বংশের উদ্ভিদ ?



হারিয়ে যাওয়া গাছ

কিন্তু আজকের দিনে, নামী দামী গাছের ছায়ায় বসে তোমাদেরই মনে হবে, গেল কোথায় সে সব গাছ ?

বিজ্ঞানীরাই অবশ্য অনেক হিসেব নিকেশ করে বার করেছেন এর উত্তর।

আসলে কি হয়েছিল জানো।

পৃথিবী তো ঠাণ্ডা হলো আস্তে আস্তে। জলের পাশে জেগে উঠল ডাঙ্গা। মাটিতে বসলো সবুজ গাছ গাছালির মেলা। দেখতে দেখতে পৃথিবী ছেয়ে গেল জঙ্গলে। পাশাপাশি, ঠেসাঠেসি করে দাঁড়াতে গিয়ে কত কমজোরি গাছ হেরে গেল। মানে, শুকিয়ে গেল মাটিতেই।

তারপর এলো প্রাণী। তারাই হলো সেদিন গাছেদের পরম শত্রু। তারাই একদিন খেতে শুরু করল গাছের পাতা। নরম কচি কচি ডাল।

সে কথাও একটু ভালো করে বলি এবার।

আগেই পড়েছ, পৃথিবীর প্রথম জীব জন্মেছিল জলে। ঠিক প্রাণীদের বেলাতেই হলো তেমনি। প্রথম প্রাণী অ্যামিবাও একদিন নড়ে চড়ে উঠল জলে। তার তো আবার হাড় গোড় নেই। সে না থাক। তার জাতভাইরাও সব একই রকম।

পরে পরে অবশ্য নিজেদের বাঁচানোর তাগিদে কারো কারো গায়ে উঠল শক্ত খোলসের জামা। শামুক গেঁড়ি, ঝিনুক আর শাঁখ হচ্ছে সেই দলের প্রাণী।

আসলে এমনি করেই ভিড় বাড়তে লাগল জলে। তারপর কতকগুলো সাহসী প্রাণী একদিন সাহস করে উঠে এলো ডাঙ্গায়।

জলের তলায় চলছিল দিনরাত গুঁতোগুতি, মারামারি। প্রাণ বাঁচাতে তাই ডাঙ্গায় উঠে এলো অনেকে। উঠলেই তো হলো না। খাবে কি ?



চোখে পড়ল গাছ। ঝলমলে সবুজ পাতা। নধর ডাল। তোমরা বলবে, বারে! সেই আদ্যিকালের পৃথিবীতে কি মানুষ ছিল যে লিখে রেখে গেছে সব কিছু?

তাই তো বলছিলুম। কি অবাক কাণ্ড দেখো পৃথিবীতে। মানুষের লেখা বই না থাক, খামখেয়ালি প্রকৃতি মানুষের জন্যেই রেখে গেছে তার সব বড় বড় যাদুঘর। সেই যাদুঘর কখনও আমরা খুঁজে পেয়েছি পাহাড়ের গুহায়, মরুভূমির নিচে, সমুদ্র বা নদীর গভীরে, কখনো মাটির তলায়।

সেই যাদুঘরেই জমানো আছে প্রকৃতির নিজের ভাষায় লেখা কতরকম সব দরকারি বই।

বিজ্ঞানের ভাষায় তাদেরই আমরা বলি 'ফসিল'।

বাংলায় জীবাশ্ম।

মনে রোখো, অশ্ম মানে কিন্তু পাথর।

আসলে হাজার হাজার বছর ধরে কত গাছ, কত প্রাণী মাটিরতলায় চাপা পড়ে আস্তে আস্তে একদিন হয়ে উঠেছে পাথুরে গাছ, নয়ত পাথুরে প্রাণী। তাদেরই বলি ফসিল।

কলকাতার যাদুঘরে গেলে দেখবে বিশকোটি বছরের একটা পাথুরে গাছ কেমন টান টান হয়ে শুয়ে আছে নিচের বারান্দায়।

তাই যা বলতে চেয়েছিলুম, এবার বরং বলে নিই সেইটুকু।

প্রাণীদের কথা তো একটু হলো। কিন্তু আবহাওয়া ?

হ্যাঁ, সেই আদিম কালের আবহাওয়া ছিল বড় খামখেয়ালি। গাছপালার হারিয়ে যাওয়ার পিছনে প্রকৃতিও বাদ সাধত তখন। ধরো, পৃথিবীর যেদিকটায় ছিল গভীর জঙ্গল, হঠাৎ একদিন সেখানে নেমে আসত বরফের নদী। বয়ে যেত তুষার ঝড়। একটানা বারো কোটি বছর নাকি বরফে ঢাকা ছিল পৃথিবী। ভাবতে পারছ ব্যাপারটা ?

অত ঠাণ্ডায় কি করে বেঁচে থাকবে গাছপালা ! অতএব মরতেই হতো তাদের।

তারপর আসত অনাবৃষ্টির পালা। গাছগাছালির গায়ে এসে লাগত গনগনে রোদের আগুন। কোথাও সবুজ অরণ্য হারিয়ে সৃষ্টি হতো মরুভূমির।

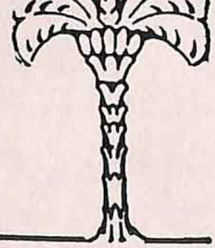
মাটির তলায় চাপা পড়ত গাছ।

সে সব কি আর হাজার দুহাজার বছরের কথা ! বুঝতেই পারছ, লক্ষ লক্ষ বছর পরে পণ্ডিতেরা পেয়েছেন তাদের হদিস। খামখেয়ালি প্রকৃতির পাঠশালায় তখন ওই হয়েছে সব ফসিল। প্রাণী হয়েছে পাথর।

কিন্তু গাছেরা সব গেল কোথায় ?

বারে ! তারাই তো কয়লা হয়ে রয়েছে কবে থেকে।

খনি থেকে বেরিয়েই মানুষের সভ্যতাকে সেই কালো সোনারাই এগিয়ে দিয়েছে অনেকখানি। তোমরাই বলো, গাছ না থাকলে কয়লা আমরা পেতুম কোথায় ?



চেনা গাছের কথা

কম করেও আড়াই লক্ষ গাছের সন্ধান পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা।

তাহলেই বোঝো, যে সব গাছ হারিয়ে গেছে তাদের কথা বাদ দিলেও, সব

গাছকে সবাই কি আর চিনি ?

চিনিনা বলেই তো, তোমাদেরও বলছি চটপট একটা গাছের খাতা বানিয়ে নাও তোমরা। প্রথমেই লিখতে শুরু করো চেনা গাছের নাম। তাদের ধরণধারণ, পাতার গড়ন, ফল ফুলের কথা।

তারপর এসো, বেরিয়ে পড়ি বাগানে বাগানে। যে গাছ চিনিনা, জানিনা —তাদের যারা চেনে, খুঁজে খুঁজে খবর নিয়ে চিনতে হবে তাদের। নতুন গাছ চেনা হলেই টুকতে হবে খাতায়। দেখতে দেখতে গাছের খাতার পাতায় পাতায় ফুটে উঠবে কত গাছের ছবি। লেখা হবে তাদের খবর।

আগেই বলেছি, গাছ শুধু আমার কি তোমার নয়। গাছ আমাদের সবার বন্ধু। তাই বন্ধুকে ভালো করে না চিনলে চলে ?





জানোই তো, আমাদের প্রতিদিনের জীবন যাত্রার সঙ্গে গভীর ভাবে জড়িয়ে আছে গাছ। কেউ দেয় গন্ধভরা ফুল। কেউ দেয় মিষ্টি মিষ্টি ফল। শুধু তাই কেন ?

গাছের ফসল, বীজ, শিকড়, পাতা, ডাল কত কিছুই তো কত কাজে লাগে আমাদের। গাছ না থাকলে কি খেতুম আমরা ?

কেউ বলবে, কেন, গরুর দুধ।

আমি কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বলব, কিন্তু গরু কি খেয়ে বাঁচবে ? ঘাস না হলে, খড় না থাকলে গরু কি খেয়ে বাঁচতো ?

ধান গাছ না হলে, কে আমাদের ভাত দিত থালায় ? গম গাছ না হলে কোথায় পেতুম রুটি ? আলু, বেগুন, পটল, মুলো, সজনে ডাঁটা বাজারে কে আনতো আমাদের জন্যে ?

অবশ্য শুধু খাওয়া দাওয়ার কথাই বা বলি কেন ? গাছ না থাকলে আমাদের ঘর বাড়ি হতো কেমন করে ?

মাটি দিয়ে ইট গড়েও কিছু হতো কি ?

কয়লা কোথায় পেতে ইট পোড়ানোর ? তারওপর দরজা, জানলা, টেবিল, চেয়ার, খাট আর বই রাখার অমন সুন্দর কাঠের আলমারি কে তৈরি করে দিত তোমাকে ?

পাকাবাড়ির কথা বাদ দাও।

আমাদের গাঁ-গেরামের দরমার বেড়া দেওয়া ঘর তৈরি হতো কি করে ? মাটির দেওয়াল দেবে ? বেশ তো।

বাঁশের খুঁটি চাই দাওয়ায়। ঘর ছাইতেও চাই বাঁশ। নারকেল দড়ি। খড় অথবা তালগাছের পাতা।

চেনা গাছের মধ্যে এসো বরং নারকেল গাছকেই ধরি সবার আগে।

ধরো, লম্বা সিড়িঙ্গে একটা নারকেলের গাছ। আমরা কেউ তার দিকে বড় একটা নজর দিই না। ছোটবেলায় যা একটু যত্ন-আত্তি করেছি। এখন তো বড় হয়ে গেছে। জ্যোৎস্না রাতে বারান্দায় বসে দেখি চাঁদের আলোয় কেমন ঝির ঝির করে সুর উঠছে তার পাতায়।

কিন্তু কাঠফাটা রোদে একটু মিষ্টি জল খাবার দরকার হলেই আমরা নারকেল গাছে উঠে ছিঁড়ে নিচ্ছি তার ডাব। ঝুনো হলে তার শাঁস খাই। নারকেলের নাড়ু হলে তো ইতাদিদিমনিকেও দেখেছি কি ছোট্ট মেয়ে হয়ে যায় টুমপির মতন !

তারপর ধরো নারকেলের ছোবড়ার কথা।

দড়ি হয় যেমন, তেমন হয় গদী।

কিন্তু নারকেলের শাঁস দিয়ে যে তেল হয় সে কথাটাই তো বলতে ভুলে যাচ্ছিলুম আর একটু হলে!

বুঝতে পারছি তুমি এবার নারকেলের মালার কথা বলছো? জানি, নারকেলের মালা দিয়ে হুঁকো বানায় গাঁয়ের মানুষ। কিন্তু বিজ্ঞানীরা, অবাক করেছেন আরো।

তাঁরাই ওই নারকেলের মালাপুড়িয়ে তৈরি করছেন এক ধরনের কাঠকয়লা, যার নাকি জুড়ি নেই গুণের।

কিন্তু মায়ের দরকারের কথাটাও দেখছি মনে পড়ল না তোমার। সেটা কি বলো তো?

হ্যাঁ। ঘর দোর ঝাঁট দেবার ঝাঁটা। সেটাও হয় নারকেল গাছের পাতা থেকে। তাহলেই বোঝ, একটা চেনা গাছের কাছেই আমাদের ঋণ রোজ কতখানি করে বাড়ছে।



গাছ ছিল তাই বই

গাছ নিয়ে তাই গর্ব করা আমাদের সাজে। কি বলো?

বাড়ি ঘরের কথা বাদ দিয়ে এসো বাইরে। বাস, লরী, রেলগাড়ি আর নৌকো তৈরি করতেও দরকার হয় কাঠের। গাছ না হলে কাঠ কোথায় পেতে?

আবার কাঠের কথাই যখন উঠল তখন এসো তোমার এই বইটা নিয়েই কিছু কথা বলি। গাছ নিয়ে এই যে বই হলো, এর জন্যে আগে কাকে দরকার পড়েছে বলো তো?

হ্যাঁ। ঠিক বলেছ। সবার আগে কাজে লেগেছে কাগজকে। প্রথম লেখার দিন

থেকে শেষে ছাপার সময়েও সেই কাগজ আর কাগজ। তাহলেই দেখ, বই তৈরি হওয়ার গোড়ার কথা যেমন কাগজ, তেমন কাগজ তৈরি হওয়ার গোড়ার কথা হচ্ছে গাছ।

গাছ না হলে কাগজ কলে কিছু কাজ হবে না।

আর কাগজ না হলে বই কোথায় পাবে? কোথায় পাবে লেখার খাতা? খবরের কাগজ? চিঠি লেখার খাম কি পোস্টকার্ড?

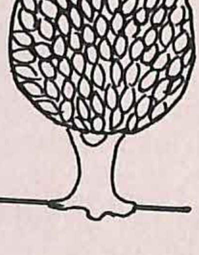
কিন্তু কাগজ যখন হয়নি, জানো তো, তখনও মানুষ কাজে লাগিয়েছিল গাছের ছাল, আর গাছের পাতাকে। এখনও কত তালপাতার পুঁথি, ভূর্জগাছের পাতায় লেখা কত কবিতা রাখা আছে কলকাতার বড় যাদুঘরের বাড়িতে। তা ছাড়া মিশরে মানুষের সভ্যতার সেই সকাল বেলার ইতিহাসে নিশ্চয়ই পড়েছ প্যাপিরাসের কথা। নীলনদের ধারের নলখাগড়ার মতন দেখতে সেই প্যাপিরাস গাছ থেকেই এসেছিল পেপার কথাটা!

প্যাপিরাস হলেও তো সে একটা গাছ।

তাহলেই দেখো, সভ্যতার সূচনাতেও গাছ ছিল মানুষের পরম বন্ধু।

তাই বলছিলুম, গাছ না থাকলে যেমন বেঁচে থাকার প্রশ্ন উঠত না আমাদের, তেমনি বই কোথায় পেতাম বলতে পারো।

গাছ না থাকলে গাছের এই গল্পটাই লেখা হতো না হয়ত। হলেও ছাপা হতো না কাগজে। আর ছাপা না হলে তোমরাই বা বাড়ি বসে এই বইটা পড়তে পেতে কি করে?



গাছ চেনা চাই আগে

আগেই তো বলেছি, সব গাছ চেনা কি সহজ ব্যাপার? তবুও তো চেষ্টা চাই চেনার। না হলে সত্যি সত্যি গাছ আমাদের বন্ধু হবে কি করে!

তাই একটা সুন্দর নিয়ম বার করেছেন বিজ্ঞানীরা। সেটা আর এমন কিছু

কঠিন নয়। আলাদা আলাদা দলে ভাগ করা হয়েছে গাছকে।

মানুষের বেলায় যেমন, বলতে পারো গাছের বেলাতেও প্রায় তেমনি।

গাছের চালচলন, ধরনধারণ বংশপরিচয় সব রকম পরীক্ষা করেই বিজ্ঞানীরা কে কোন গোষ্ঠীতে পড়বে ভাগ করেছেন তাদের। মনে রেখ, এই ব্যাপারে বিজ্ঞানী ক্যারোলাস লিনিয়াসের দান অসামান্য। তিনি একজন বিখ্যাত সুইডিস প্রকৃতিবিদ।

তা ওই যে বলছিলুম, গাছের গোষ্ঠীর কথা, সেটাই এবার বলি। গোড়াতেই কিন্তু বড় বড় চারটে ভাগে ভাগ করে নেওয়া হয়েছে গাছেদের।

নামগুলো শুনতেও খটকা লাগবে তোমার। তার কারণ, বিজ্ঞানীরা যাঁরা এসব ভাগ বাঁটোয়ারা করেছেন, তাঁরা প্রায় সবাই বিদেশের মানুষ। তাই সেই বিদেশী ভাষাতেই শোন গাছেদের বড় বড় চার ভাগের চারটে নাম। (১) হাইড্রোফাইট (২) হেরোফাইট (৩) মেসোফাইট (৪) হ্যালোফাইট।

তোমাদের গাছ চেনার সুবিধের জন্যে এবার বলি কে কোন দলে পড়ছে।

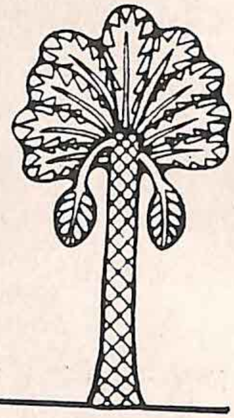
হাইড্রোফাইট আসলে জলজ উদ্ভিদ।

জলেই যাদের বসবাস তাদেরই ডাকা হয় এই নামে। বিজ্ঞানীরা আবার তাদেরও ভাগ করছেন তিনভাগে। ভেসে থাকা কুচুরিপানা, জলে ডুবে থাকে যে শ্যাওলা আর খানিকটা জলে ডুবে মানে যেসব গাছের শেকড় আর কাণ্ড থাকে জলে কিন্তু পাতা আর ফুল ভাসে জলের ওপর তাদেরই তিনটে দলের তিন রকম নাম। শেষের সেই দলে পড়ছে শালুক আর পদ্ম।

তারপর এসো জাঙ্গল উদ্ভিদের কথায়। ইংরেজি নাম হেরোফাইট। যেখানে জলের পরিমাণ কম, আবহাওয়া দারুণ শুকনো সেখানে যেসব গাছ জন্মায় তাদেরও তো দু একটিকে তোমরা চেনো, ফণিমনসা আর বাবলা মরুভূমির বাসিন্দা।

কিন্তু আমাদের চেনা আম জাম, কাঁঠাল, বট আর অশ্বত্থর দেখা পাই সাধারণ পরিবেশে। যেখানে মাটিতে জল আর খনিজ লবনের পরিমান স্বাভাবিক সেখানেই জন্মায় এইসব গাছ। ইংরেজি নাম মেসোফাইট। বাংলায় বলি স্থলজ উদ্ভিদ।

শুধু শেষ ভাগে পড়ে হ্যালোফাইট। বাংলায় বলি লবনাম্বু উদ্ভিদ। নোনামাটিতে যেসব গাছ জন্মায় তাদেরই বিজ্ঞানীরা নাম দিয়েছেন এই রকম। আমাদের সুন্দরবন এলাকার সুন্দরী গেঁও আর গরাণ গাছেরা পড়ে এই দলে।



বিজ্ঞানীদের আগে

কিন্তু একটা কথা মনে রেখ।

বিজ্ঞান যখন এতখানি বড় হয়নি পৃথিবীতে, যখন ইয়োরোপের পণ্ডিতেরা গাছের শ্রেণী বিভাগে এগিয়েও আসতে পারেননি এতখানি, তখন কিন্তু আমাদের দেশে পিছিয়ে ছিলেন না ঋষিরা।

প্রাচীন কাল থেকেই ভারতবর্ষের মুনি ঋষিরা প্রচুর চর্চা করতেন গাছপালার। অরণ্যেই ছিল তাদের আশ্রম। রাজারাজড়ার ছেলেরাও লেখাপড়া করতেন সেখানে।

জানো হয়ত, আমাদের বেদ আর উপনিষদ লেখা হয়েছে সেইসব অরণ্য ঘেরা আশ্রমে। গাছের কথা উল্লেখ করেই কত শ্লোক রচনা করেছেন ঋষিরা।

রামায়ণ আর মহাভারতেও রয়েছে অনেক বনের কথা। সেই সব বনবাসী ঋষির কত তপস্যা কত সাধনার কাহিনী তো আমরা পড়েছি বেদ, পুরাণ আর মহাকাব্যে।

যদি গাছেদের শ্রেণীবিভাগের কথাই বলো, তাহলেও বলব অথর্ব বেদের মধ্যেই তার প্রমাণ পাবে তোমরা।

ঋষির নাম চক্রপাণি।

হ্যাঁ, তিনিই তো চার ভাগে ভাগ করেছিলেন গাছেদের। বনস্পতি, বানস্পত্য, ওষধি আর বিরুধ।

বুঝতেই পারছ এই চার ভাগের গাছগাছালির চার রকম ধরনধারণ আর জীবনযাত্রা।

আগে বনস্পতির কথাতেই এসো।



যে সব গাছে ফল হয় কিন্তু ফুল সহজে চোখে পড়ে না,ঋষিরা সেইসব গাছকে ফেললেন বনস্পতির দলে। আবার যে সব গাছে ফুল এবং ফল দুই-ই হয় তাদের নাম দিলেন বানস্পত্য।

কিন্তু ওষধি হচ্ছে সেই সব গাছ, ফল দিয়েই যারা মরে যায়।

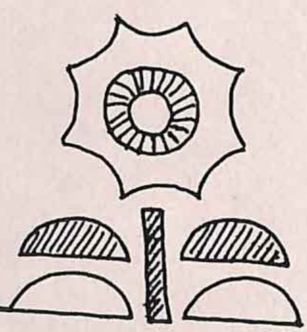
আর লতা, ঝোপজঙ্গল যাদের ডালপালা চারদিকে ছড়ানো তাদের নাম বিরুধ। চক্রপাণি ঋষি ছাড়াও আমাদের দেশে আরও অনেক পণ্ডিত মাথা ঘামিয়েছেন গাছ নিয়ে। নানান ভাগে ভাগও করেছেন তাদের।

কোনও কোনও পণ্ডিতের মতে গাছ ছ রকম।

বনস্পতি, বৃক্ষ, লতা, ওষধি, তৃণ এবং অবতান।

তাঁদের মতে আমগাছ পড়ে অবতানের মধ্যে। কিন্তু অসুখে বিসুখে কত রকম গাছকে আমাদের কত কাজে লাগে তার কথা আর নতুন করে বলব কি!

জানোই তো, কবিরাজি আর অ্যালোপাথি ওষধু তৈরি করতে কতরকম গাছপালা, ফুল, লতা, শেকড় লাগে তার হিসেব দেওয়া মুসকিল। তবু জেনে রাখা ভাল নিম, অশোক, হরিতকি, অপরাজিতা, আমলকি, তুলসি, পাথরকুচি, গাঁদা আর তেঁতুলের মত বহু গাছকেই দরকার পড়ে অসুখ বিসুখ সারাতে।



গাছ থেকে পাই আরও

গাছ থেকে আমরা যে কত কি পাই, তার ঠিক নেই। দু একটা জানা ওষুধের কথা দিয়েই বরং শুরু করি সেই পর্বটা।

সর্দিজ্বর হলেই দেখেছি তুলসিপাতা, বাসকপাতা আর তার ছাল সেদ্ধ জল খাইয়ে দেওয়া হয় ছোটনকে। ক্রিমি হলেই টুম্পু খায় চিরেতার জল। মিঠিনকে দেখেছি ওর মা পেটের অসুখ আর লিভারের জন্যে খেতে দেয় কালমেঘের বড়ি, কুরচির বীজ। চোখের রোগে আর চামড়ার কোনও অসুখ হলেই বাড়িতে আসে

নিমপাতা। তবে ম্যালেরিয়ার জন্যে কুইনাইন নামে যে ওষুধটা তৈরি হয়েছে সেও তো সেই সিনকোনা গাছ থেকে।

শুধু তাই কেন, আজকের বিজ্ঞান তো গাছ থেকেই উৎপন্ন করছে কত রাসায়নিক দ্রব্য। যার মধ্যে অ্যাসেটিক এসিড মেথানল, আর মিথাইল এসিটোনের নাম তোমাদেরও অনেকের জানা।

কিন্তু চন্দন গাছের কথা যদি বলো, তাহলে তো আগেই বলতে হয় তার সুগন্ধের কথা। আমাদের দেশে মহীশূরেই আছে চন্দন গাছের রাজ্য। চন্দনগাছ আমাদের উপহার দিয়েছে সুগন্ধি তেল, সাবান আর কাঠ। সেই কাঠ দিয়ে আমরা কত কারুকাজ করি। দেশে বিদেশে তার যে কত দাম সে আর কি বলব !

আর একটা গাছ আছে আমাদের আসামে।

ভুটান আর ব্রহ্মদেশেও গাছটা জন্মায়। নামটাও বেশ সুন্দর। আগর আগর। সেই গাছ থেকেই আমরা পাই আর একরকম সুগন্ধি তেল। সঙ্গে খুব দামী আতর।

পাইনগাছ থেকে পাই তার্পিন তেল।

বাবলা গাছের শুঁটি আর আঠা থেকে তৈরি হয় একেশিয়া। কিন্তু রং পাকা করার কাজেও বাবলা গাছের অবদান অনেক।

রঙের কথাই যখন উঠল, তখন গর্জন গাছের কথাটাও একটু বলি। প্রতিমার রঙের কাজ শেষ হয়ে গেলেই চাকচিক্য বাড়ানোর জন্যে শিল্পী ব্যবহার করেন গর্জন তেল।

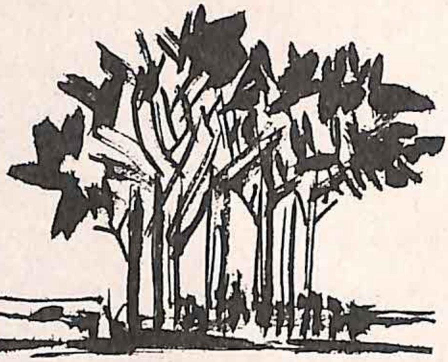
বাঁশ আর বেত বন থেকে বেরিয়ে এলেই বোঝা যায় কত রকম দরকারি কাজে লাগছে ওদের। আমাদের আসাম আর ত্রিপুরা রাজ্যে বেত আর বাঁশের তৈরি শিল্প-সামগ্রী সারা পৃথিবীতেই বেশ দাম পায় নিশ্চয় জানো।

কিন্তু কাকে ছেড়ে কার কথা বলব।

গাছ থেকেই আমরা পাই কর্পূর। পাই হরিতকী। ট্যানিল এ্যাসিডের জন্যে যার দাম এখন অনেক। ভারত ছাড়া অন্য কোনও দেশে হয়না এই হরিতকী।

তবু তোমার ছোটবেলার সেই রবারের বলটাকেই কি সহজে ভোলা যায় বলতে পারো।

হ্যাঁ। রবার গাছের আঠা থেকেই আমরা পাই রবার। হিমালয়ের কাছাকাছি নেপাল, আসাম, আর খাসিয়া পাহাড়ের কাছাকাছি রবার গাছকে দেখতে পাবে বেড়াতে গেলে। আসলে রবার গাছ সব জায়গায় হয় না কিনা !



গাছগাছালির বয়স

বোবা গাছের বয়েস নিয়ে সত্যিই ভারি মুসকিল হয়েছিল প্রথম প্রথম। কিন্তু বিজ্ঞানীদের কাছে কদ্দিন আর বয়েস লুকোনো থাকবে গাছের। মাথা খাটিয়ে খাটিয়ে তাঁরাই একদিন বের করলেন সহজ একটা নিয়ম। বেরিয়ে পড়ল গাছের বয়েস।

ওই যে আগে বললুম কলকাতা যাদুঘরের বারান্দায় সটান শুয়ে থাকা একটা পাথুরে গাছের কথা। কি কাণ্ড বলো, মাটির তলায় চাপা পড়ে বেচারি সবুজ পাতার সাজ পরা গাছ, হয়ে গেল কিনা শক্ত পাথর। তবু গাছ তো! বিজ্ঞানীরা হিসেব করে ঠিক বলে দিলেন, ওর বয়েস কিনা বিশ কোটি বছর।

তাহলেই বোঝ কি মজার ব্যাপার!

আমি অবশ্য জ্যান্ত গাছের বয়েস নিয়েই বিশদ ভাবে বলতে চাই তোমাকে।

যেমন ধরো, মানুষের কথা। সাধারণত মানুষ সত্তর থেকে আশি বছর বাঁচে। একশো বছরও বেঁচে থাকে এমন বুড়ো থুত্থুড়ো দাদুদিদিমার কথা তোমরাও কেউ কেউ শুনেছ। হয়ত চোখেও দেখেছ অনেকে।

তেমনি জন্তুজানোয়ারদের মধ্যে আট থেকে দশবছর বাঁচে কুকুর। গরু কিম্বা ঘোড়ারা বেঁচে থাকে কুড়ি থেকে বাইশ বছর। আবার হাতির বেলায় বেঁচে থাকার হিসাবটা বেশ বেড়ে যায়। মনে রেখো, হাতি প্রায় আশি থেকে একশো বছর বাঁচে। কুমির আবার ছাড়িয়ে যায় হাতিকেও। দেড়শো বছর বেঁচে আছে, এমন কুমিরের কথা প্রায়ই শোনা যায়।

কিন্তু প্রাণীদের মধ্যে ফার্স্টপ্রাইজ পাবার মতন বেঁচে থাকে দুজন। কচ্ছপ আর তিমি। প্রায় তিনশো বছরও বেঁচে থাকে দিব্যি।

তবু সবাইকে টপকে যায় গাছ।

তুমি হয়ত তোমার চেনা বোটানিক্যাল গার্ডেনের সেই বিরাট গাছটার কথা বলবে। জানি, মাত্র দুশো বছর পেরিয়ে গেছে তার বয়েস। কিন্তু আমাদের

দেশেই বুদ্ধগয়ার বিখ্যাত বোধিদ্রুমের বয়েস নিয়ে তর্ক করার কিছু নেই। যদিও জানি, ওটি বুদ্ধদেবের আমলের সেই গাছ নয়, তারই বীজ থেকে জন্মেছে।

শুধু তাই কেন, আমাদের ঘরের পাশেই যে নবদ্বীপ। তারই অপর পারে মায়াপুরের কাছে চাঁদগাজীর সমাধির ওপর রয়েছে একটা গোলাপচাঁপার গাছ। চৈতন্যদেবের সময়কার সে।

আমাদের দেশের বুড়ো বট আর অশ্বত্থ গাছের ছায়া থেকে চলো বরং পা বাড়াই এদেশের বাইরে।

পাশেই তো শ্রীলঙ্কা।

সেখানেই নাকি আছে একটা প্রাচীন অশ্বত্থ গাছ। যার বয়েস দু হাজার বছরের বেশি। আর একটু আগে যে বুদ্ধগয়ার বোধিদ্রুমের কথা বললুম, তারই একটি ডাল নিয়ে সম্রাট অশোকের ছেলে মহেন্দ্র একদিন ভারতবর্ষ থেকে বুদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য গিয়েছিলেন সেদিনের সিংহলে। স্মৃতি চিহ্ন হিসেবে পুঁতে এসেছিলেন সেই ডাল। সেটি নাকি এখনও বেঁচে আছে অনুরাধপুরে।

ওখান থেকেই বরং চলো আমেরিকায়। পৃথিবীর সব চেয়ে দীর্ঘ দেহী গাছ রেডউডদের দেখে আসি। সবার চেয়ে মাথায় যে গাছটি লম্বা তার মাপ নিয়েছেন বিজ্ঞানীরা। উচ্চতায় ৩৬৬ ফুটেরও বেশি। তারাও বাঁচে দেড় থেকে দু হাজার বছরের ওপর।

কিন্তু আফ্রিকার জঙ্গলে এমনি অনেক গাছ আছে এখনও। যাদের কাছে পৌঁছতে পারেননি বিজ্ঞানীরা। তবু ইংলণ্ডের ওক গাছ—আমাদের দেশের বট আর অশ্বত্থ গাছের মতই তিন থেকে চারশ বছরও বেঁচে থাকে।

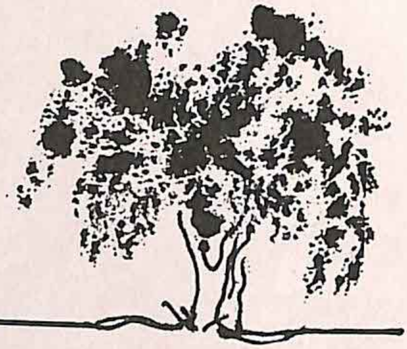
তুমি হয়ত বলবে, পৃথিবীতে তাহলে সবচেয়ে প্রাচীন গাছটি কোথায় আছে? কি নাম তার?

জেনে রাখো, গাছটার নাম পাইন।

ক্যালিফোর্নিয়ার কাছে নেভাদায় আছে সবচেয়ে বুড়ো সেই গাছটি। যার বয়স এখন পাঁচ হাজার বছর ছাড়িয়ে গেছে।

বড় গাছের কথা বাদ দাও এবার। এসো ছোট গাছের কথায়। ধান, গম, লাউ, কমুড়ো, সীম আর বেগুন—এরা তো এক বছরের বেশি কেউ বাঁচেই না। দু বছরের মত বাঁচে কলাগাছ।

কিন্তু আম, জাম, নিম কি তেঁতুল, এসব গাছ তিরিশ চল্লিশ থেকে শুরু করে আশি পর্যন্ত বেঁচে থাকে অনায়াসে।



গাছের গড়ন-ধরনধারণ

জীবজন্তু আর মানুষ সবার বেলাই দেখ শরীরের কেমন গড়ন আর ধরনধারণ আছে একটা। অনেকের সঙ্গেই চেহারার মিল আছে অনেকটা। সবারই আছে চোখ, নাক, কান আর মাথা।

মানুষের শরীরের সঙ্গেই জোড়া আছে দুটো হাত আর দুটো পা। জন্তুদের হাত নেই অবশ্য। চারটেই পা। পাখিদের আবার দুটো পা। কিন্তু হাতের বদলে আছে দিব্যি দুটো ডানা। মাছেদেরও অনেকটা তাই।

কিন্তু গাছেদের সঙ্গে যেন মিল নেই কারোর। তবু সেই মেসোফাইট জাতের গাছগুলোর শরীরের গড়নের মধ্যে বেশ একটা নিয়ম আছে।

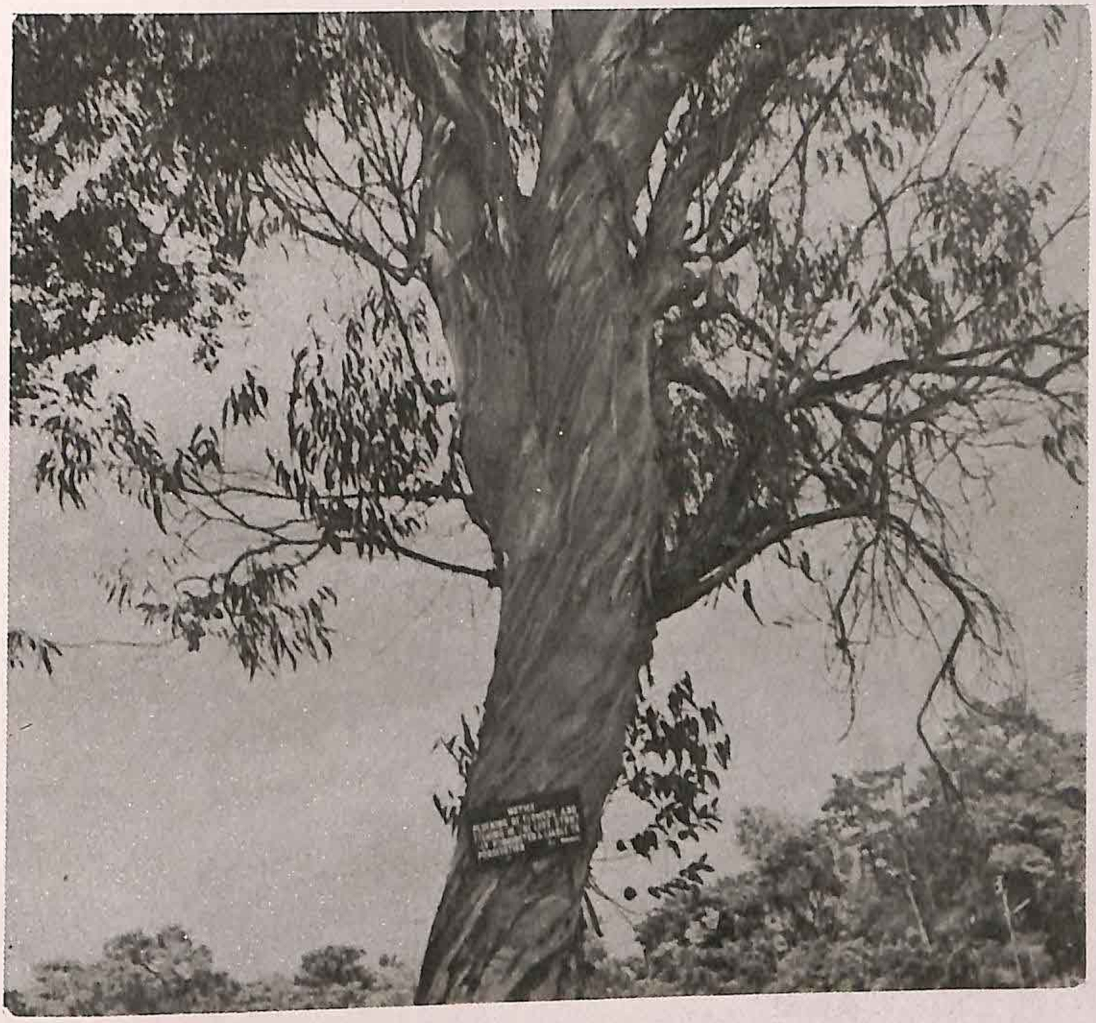
আমাদের শরীরের কাঠামো যেমন হাড়। কেউ বলি কঙ্কাল। তা সেই হাড়ের কাঠামোর জন্যই তো শরীরটাকে খাড়া রাখতে পারি আমরা।

তেমনি ওই মেসোফাইট স্থলজ উদ্ভিদের বেলাতেও শিকড় আর গুঁড়ি হচ্ছে তাদের শরীরের কাঠামো। নিচে শিকড় ছড়িয়ে দিয়ে গাছ কেমন সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। গাছের শিকড়ই কামড়ে থাকে মাটিকে। মাটির ওপর থাকে গুঁড়ি। যাকে আমরা কাণ্ড বলি। সেই কাণ্ডের ওপরেই আকাশের আলোর দিকে হাত তুলে থাকে গাছের ডাল। সেই ডালের গায়ে গায়ে লাগানো থাকে পাতা। পাতার কোলে আবার লুকিয়ে থাকে কচি পাতার কুঁড়ি। হঠাৎ এক সকালে নতুন পাতা হয়ে দেখা দেয় দিব্যি।

তারপর যখন ফুল ফোটার দিন আসে, তখন সবুজ পাতার কোলেই উঁকি দেয় ফুলের কলি। আস্তে আস্তে ফুল ফোটে। ফুল থেকে আসে ফল। গাছের বুকটা যেন ফুলে ওঠে গরবে। খানিকটা আনন্দেও বলতে পারো।

আর একটা কথা শোনো।

মনে রাখবে, গাছের গোড়াকার কথাতেও আসে শিকড়ের কথা। একটা মটর



দানা কিম্বা ছোলা নিয়ে পুঁতে দাও ভিজে মাটিতে। দেখবে কদিন বাদেই উঁকি দিচ্ছে সবুজ দুটি পাতা।

গাছটা উপড়ে দেখবে, কেমন একটা শিকড় বেরিয়েছে ছোট্ট গাছটার। আসলে, শিকড়ই বের হয় সবার আগে। বাড়িতে একদিন একমুঠো ছোলা ভিজতে দিলেই বুঝে যাবে ব্যাপারটা।

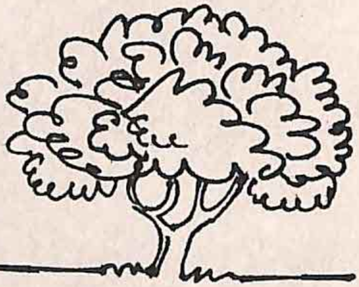
শিকড়ের স্বভাবটাও কি সুন্দর দেখ। গাছকে খাড়া রাখার জন্যে, উঁচু ডালে, পাতায় পাতায় মাটির রস, মানে খাবার দাবার পৌঁছে দেবার জন্যে সবসময়ই তার মুখ থাকে নিচের দিকে। ওপরে সে ওঠে না, ছড়িয়ে পড়ে মাটির তলায়।

শিকড় দিয়ে মাটি থেকে জল টেন নেয় গাছ। সেই সঙ্গে জলে গোলা হয়ে

আসে মাটির ভেতরের কতরকম পদার্থ। বড় হয়ে জানবে, নাইট্রোজেন ঘটিত পদার্থ, গন্ধক ঘটিত পদার্থ, ফসফরাস ঘটিত পদার্থ ছাড়াও সঙ্গে আসে লোহা, পটাসিয়াম, ক্যালসিয়ামের মত নানা রকম ধাতুর মশলা। শিকড় দিয়ে জলে গোলা এত রকম জিনিস গাছ ছড়িয়ে দেয় নিজের শরীরে। তারপর সেই দিয়েই সে তৈরি করে তার খাবার।

বটের ঝুরি দেখছ তো? ওগুলো সত্যি সত্যি কি বলো তো? হ্যাঁ। বটের শিকড় ওগুলো।

আবার মুলো আর গাজর হচ্ছে আসলে গাছের শিকড়। শিকড়ের যা কাজ তা এরা করে না। গাছের ডাল-পাতা আর কাণ্ডকে পুরুষ্টু করার জন্যে খাবার দাবার পাঠায় না মাটির ওপর। সব জমিয়ে রাখে নিজের কাছে। তাই অমন চেহারা হয় ওদের। কি মজা, তাই না!



গাছ করে কত কাজ

কাজ নিয়েই তো কতরকম কথা কাটাকাটি আমাদের। একটু কাজ করতেই কত কষ্ট অনেকের। আমরা যারা বড় হয়ে গেছি বয়সে, তারাই কাজের চেয়ে কথা বলি বেশি।

তাই তোমরা এখন যারা ছোট আছো—তারা গাছের কাছে শিখে নাও কথা না বলে শুধু কাজ করতে হয় কেমন করে। আজকের ছোট্ট চারা গাছটার মতন, তোমরাও একদিন বড় হবে আস্তে আস্তে। সেদিন সবাই দেখবে, আমাদের এই বেশি কথা বলা দেশটায়, কাজ শুরু হয়েছে নতুন করে।

তা যে কথা বলছিলাম, এবার বলি।

বোবা গাছ কথা বলতে পারে না বটে, নীরবে যে কত কাজ করে তার আর হিসেব নেই।

আগেই যে গাছের শিকড়ের কথা বলেছি, সে শুধু মাটির কাছ থেকে পাওয়া

খাবার দাবার ওপরের ডাল-পাতায় পাঠাতেই শুধু ব্যস্ত থাকে না। ধরে রাখে মাটিকে।

জানোই তো, পৃথিবীর ওপরে আছে পাতলা মাটির আবারণ। আকাশ থেকে যখন বর্ষা নামে, পাহাড় পেরিয়ে নেমে আসে বন্যা, তখন গাছ না থাকলে মাটি ধুয়ে, ধস নেমে ডাঙ্গা তলিয়ে যেত নদীতে। জমি যেত ধুয়ে মুছে। কোথায় চাষ হতো ? ফুল, ফল, ফসল পেতুম কোথায় ?

গাছ তাই মাটিকে আগলে রাখে তার শিকড় দিয়ে।

শুধু কি তাই ?

শহরে বৃষ্টি হলে জল বেরিয়ে যায় বড় বড় নর্দমা দিয়ে। সে জল কোনও কাজে লাগে না। কিন্তু গ্রামে যখন বর্ষা আসে, বৃষ্টির জল ধরে রাখে সেখানে গাছপালা। সেই জল আস্তে আস্তে গিয়ে জমা হয় মাটির তলায়। কিছুটা সে ধরে রাখে তার নিজের দরকারে। কিছুটা আবার বাষ্প হয়ে মিশে যায় আকাশে।

গাছ থাকলে বৃষ্টির তোড়কেও অনেকখানি কমিয়ে দেয় তার ডালপালা। ভালকরে দেখবে, গাছ যেখানে বেশি সেখানে বৃষ্টিও কেমন বেশি হয়, তেমনি জলও জমা থাকে অনেক। চাষের প্রয়োজনে, সেই জলেরই যোগান দেওয়া হয় নদীনালায়। গাছ দারুণ গরমের হাত থেকেও বাঁচিয়ে দেয় মানুষকে। সজীব আর সরস রাখে পরিবেশ।

জলীয় বাষ্পের কথা তো আগেই বলেছি। গাছ জল ধরে রাখার ব্যাপারে যতখানি পটু, ঠিক ততখানি ওস্তাদ জমাজলের একটা বড় অংশকে জলীয় বাষ্প হিসেবে আকাশে ফিরিয়ে দিতে।

জানোই তো, জলীয় বাষ্প আকাশে পৌঁছেই মেঘ হয়ে ডেকে ওঠে গুড় গুড় করে। মাটিও যেন শুনতে পায় মেঘের সেই জমে ওঠা মনের কথা। বৃষ্টি হয়ে যখন ঝরে, তখন তো তোমরাও তার কিছুটা শুনতে পাও জানলায় বসে বসে। তাই না ?

বিজ্ঞান কিন্তু নাম আর সম্মানে বড় হয়েও হেরে গেছে গাছের কাছে। ধরো, মস্ত একটা পাইন কি রেডউড গাছ। লম্বায় কি উঁচু হয় আগেই বলেছি।

সেই গাছের কথাই বলো। মাটি থেকে গাছের শিকড় মাটির রস পাঠিয়ে দিচ্ছে দীর্ঘকায় একটা গাছের ডালে ডালে। পাতায় পাতায়। ফুলের কুঁড়িতে। যন্ত্র দিয়ে যে জল আমরা তুলি কোনও দশ বারো তলা বাড়ির ছাদে।

কিন্তু সে জল তোলার যেমন আয়োজন, তেমনি হৈ হৈ রৈ রৈ কাণ্ড।

গাছের কাছে এতবড় একটা কাজ কত নীরবে, কত সুষ্টুভাবে পরিচালিত হয় প্রতিদিন, ভাবলেই আশ্চর্য লাগে ভারি।

তারপর এসো অক্সিজেন তৈরির কথায়।

গাছে তার পাতার কোষে কোষে জমা করে রাখে রস। সেইসব কোষের গঠনও কি বিচিত্র। শুধু তাই নয়। প্রতিটি কোষের ভেতরেই আছে একটা সুবজ পদার্থ। তার নাম ক্লোরোপ্লাস্ট। তার মধ্যেই থাকে ক্লোরোফিল অণু।

সেই সব অণু আবার সব সময় তৈরি হয়েই আছে সকাল বেলার সোনালী সূর্যের জন্যে। যেন সূর্য উঠেই, তার আলো দিয়ে ঘুম ভাঙিয়ে দেয় সবুজ পাতাদের। সবুজ ক্লোরোফিল সূর্যের আলো কিছুটা শুষে নেয়—আর সেই দিয়েই সে করে এক অসাধ্য সাধন।

জল আর কার্বনডাই অক্সাইডের মধ্যে বিক্রিয়া ঘটিয়ে তৈরি করে শর্করা জাতীয় একরকম বস্তু। সঙ্গে সঙ্গে জলকণার যে অক্সিজেন, আলাদা হয়ে পড়ে অনায়াসে। তারপর সবুজ পাতার কোষ থেকে বেরিয়ে মিশে যায় বাতাসে।

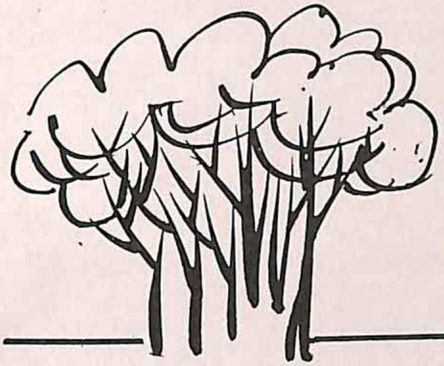
জানোই তো, শ্বাস প্রশ্বাসের জন্যে প্রতি মুহূর্তেই আমাদের দরকার হয় অক্সিজেনের। ক্লোরোফিলের সাহায্যেই বলতে পার আমরা তা পেয়ে যাই বাতাসের মাধ্যমে। আবার জরুরী এই বিক্রিয়াটি ঘটিয়ে নিজে অবিকৃত থাকে ক্লোরোফিল।

রাসায়নিক এই প্রক্রিয়াটি কত জটিল বড় হলে বুঝবে। এখন শুধু এইটুকু জেনে রাখ, এত বড় কাজ প্রতিদিন কত সহজে এবং নীরবে করে যাচ্ছে এক একটি গাছ। এর জন্যে দরকার হয়না কোনও যন্ত্রপাতি। প্রয়োজন পড়ে না কোনও ল্যাবরেটরির।

বিজ্ঞান তাই গাছের কাছে হার মেনেছে অনেক আগেই।

কি আশ্চর্য বলো ! সূর্যের আলো থেকে নিজের খাদ্য সংগ্রহ করার সঙ্গে সঙ্গেই গাছ তার মনের মত বন্ধু মানুষের জন্যে বাতাসের সাহায্যে পাঠিয়ে দিচ্ছে অক্সিজেন। নিজে দুষিত বাতাস থেকে গ্রহণ করছে কার্বনডাই অক্সাইড।

গাছকে বাদ দিয়ে পৃথিবীর তাই এক পা এগিয়ে যাবার ক্ষমতা হয়নি কখনও। আমাদের প্রতিদিনের সুখ দুঃখ এবং গৌরবের সঙ্গে জড়িয়ে আছে গাছ। সবাই যদি বুঝতাম, একটি গাছ শুধু একটি প্রাণই নয়, পরম উপকারী বন্ধু, তাহলে নিশ্চয় গাছ কাটার কথা শুনলে চোখ ফেটে জল আসত আমাদের। দু হাতে জড়িয়ে তাদের রক্ষা করতুম আমরা।



গাছ দিয়েই গড়া পরিবেশ

এই যে আমাদের ঘর-দুয়ার, গ্রাম-শহর, নদী-নালা, আকাশ-বাতাস, জল-মাটি, পশু-পাখি সবাইকেই ঘিরে আছে গাছ। তাই বলছিলুম, গাছ দিয়েই যেন গড়া হয়েছে আমাদের পরিবেশ। গাছ আমাদের সবুজ পাতার ছায়া দিয়ে ঋতুতে ঋতুতে কত রকমের ফুল দিয়ে ফল দিয়ে সজীব করে রাখছে আমাদের। বিষাক্ত বাতাসকে পরিষ্কার করে গাছ। আমাদের জন্যেই বাতাসে বাড়িয়ে দেয় অক্সিজেনের পরিমাণ।

সেই গাছের সংখ্যা বাড়তে বাড়তেই কোথাও কোথাও তৈরি হয়েছে বন। আর বন আছে বলেই তো বেঁচে আছে বন্যপ্রাণীরা। শুধু বাঘ-ভালুক, সিংহ-হাতি, শেয়াল-খটাস, জিরাফ আর জেব্রারাই নয়, কত পাখি, কত কীটপতঙ্গ, শান্তিতে বেঁচে আছে শুধু বন আছে বলেই।

গাছ না থাকলে, কোথায় বাসা বানাত পাখিরা ! ফুল না ফুটলে মৌমাছিদের মৌচাক তৈরি হতে কি করে ! আর মৌচাক না হলে কোথায় মধু পেতাম আমরা ?

আবার বন না থাকলে বাঘ ভালুক খিদের জ্বালায় বেরিয়ে পড়ত লোকালয়ে। বাঘের ভয়ে তখন বাড়ির বাইরে বের হতে ভয় পেতুম আমরা। ফসলের মধ্যে হুমড়ি খেয়ে পড়ত হরিণরা।

ঠিক শিকারের বেলাতেও এই কথা খাটে। বনের বাঘকে মেরে ফেললে, হরিণ, শুয়োর আর খরগোসরা এমন বেড়ে যাবে যে, চাষ করা বিপদ হবে মাঠে। বন থেকে বেরিয়ে পড়বে তারা।

তেমনি হরিণ শিকার করে বন ফাঁকা করে দিলেও মুস্কিল। পেটের জ্বালায় বন থেকে বেরিয়ে পড়বে বাঘ।

চাষের জমিতে দেখবে কত গাছপালা, ফুল ফল খেয়ে নষ্ট করে কত রকম পোকা মাকড়। প্রকৃতিতেই কি সুন্দর ব্যবস্থা বলো তো, কত পাখি আর ব্যাঙ

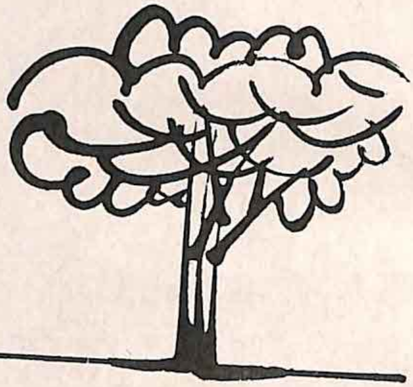
শুধু পোকামাকড় খেয়েই বেঁচে থাকে।

তাই পাখি আর ব্যাঙ মারা পড়লে কি হয়?

কেন, পোকা মাকড়ের সংখ্যা বেড়ে যায়। পরিবেশ বিষাক্ত হতে বেশি দেরি হয় না।

তাই বনের প্রাণীদের বাঁচিয়ে রাখা কেন দরকার। বুঝতে পারছ নিশ্চয়। অভয়ারন্যও সৃষ্টি হয়েছে সেই কারণে। যেখানে নির্ভয়ে বনের জীবজন্তুরা ঘুরে বেড়াবে। বনের মধ্যেই থাকবে তাদের বাড়ির ঠিকানা।

আর সেই কারণেই বন বাড়ানোর কাজে মন দিতে হবে মানুষকে। কারণ, মানুষের যত্ন আর ভালবাসা না পেলে একটা গাছ তাড়াতাড়ি বড় হবে কি করে?



চলো গাছ বসাই

এবার বরং চলো গাছ বসাই বাড়ির কাছাকাছি।

আমাদের ভারতবর্ষের মত এই বিরাট দেশে গাছের প্রয়োজন প্রচুর। তাই চলো, বন বিভাগের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে আজকেই একটা গাছের চারা বসাই আমাদের বাগানে। ছোট্ট গাছ বড় হয়ে যেদিন ফুল ফোটাবে সেদিন কি আনন্দ হবে বলোতো?





